এডুকেশন ওয়াচ ২০১৮-১৯

চতুর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষকবৃন্দ

সারসংক্ষেপ

www.campebd.org

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৮-১৯
চতুর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে
বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষকবৃন্দ

মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

সমীর রঞ্জন নাথ
মুহাম্মদ নাজমুল হক
রাসেল বাবু
নওরীন ইয়াসমীন
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সায়রা হোসেন
আহমেদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

অক্টোবর ২০১৯

গণসাক্ষরতা অভিযান

brac

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান

© *প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রতিবেদনের কোনো অংশ বা পূর্ণ প্রতিবেদন পুনঃপ্রকাশ/মুদ্রণের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।*

ছবি
গণসাক্ষরতা অভিযান ও দৈনিক শিক্ষা

প্রচ্ছদ
নিত্ত চন্দ্র

মুদ্রণে: ম্যাসিভ

আইএসবিএন নম্বর- ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৭৪৩১-৫

যোগাযোগের ঠিকানা
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন: + (৮৮০-২) - ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১, ৮১৪২০২৪
ফ্যাক্স: + (৮৮০-২) - ৯১২৩৮৪২,
info@campebd.org
www. campebd.org
facebook.com/campebd
twitter.com/campebd

ক. গবেষণা পটভূমি

শিক্ষকদের ওপর পরিচালিত গবেষণাগুলো অত্যন্ত জোরালোভাবে এই বার্তা দেয় যে- শিক্ষকরা হচ্ছেন গুণগত শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সারাবিশ্বে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করাই শুধু নয়, বরং শিক্ষাক্রমকে গঠন ও পুনর্গঠন করা এবং কার্যকরভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বায়নের এই যুগে, শিক্ষকদের ভূমিকা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এসব কারণে জননীতি প্রণয়ন এবং এসংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনায় শিক্ষক-সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। গুণগত শিক্ষার কথা বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত চতুর্থ অভীষ্টে শিক্ষককেন্দ্রিক নিচের লক্ষ্যটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

> ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষকরে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহে মানসম্পন্ন শিক্ষক সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা; এজন্য প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যটি শিক্ষা-সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যটির সাথে সম্পর্কিত; যাতে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য 'কার্যকর শিখন ফল অর্জনের' ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের মৌলিক শর্ত হিসেবে শিক্ষকদের বর্ণনা করে ইউনেস্কোর এক দলিলে বলা হয়েছে-শিক্ষকরা হবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় নিয়োগপ্রাপ্ত, পর্যাপ্ত সম্মানীর অধিকারী, শিক্ষকতার জন্য আগ্রহী এবং পেশাগত ভাবে উপযুক্ত। তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণের সংস্থান করতে হবে এবং একটি সুদক্ষ ও কার্যকর পরিচালন ব্যবস্থার সহায়তা দিতে হবে।

বাংলাদেশে শিক্ষকদের ওপর খুব কম গবেষণা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত *এডুকেশন ওয়াচ*-এর বেশ কয়েকটি গবেষণায় শিক্ষক-সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় অনুসন্ধান করা হয়েছে; বিশেষকরে, ২০০০ সালের গবেষণাটির একটা বড় অংশই প্রাথমিকস্তরের শিক্ষকদের নিয়ে করা। অবশ্য অন্য গবেষণাগুলোর কোনোটিতেই বিদ্যালয় শিক্ষকদের অনুসন্ধানের মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এ পরিস্থিতিতে *এডুকেশন ওয়াচ* দল শিক্ষক-সম্পর্কিত বিষয়াদি অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গবেষণাক্ষেত্রটির ব্যাপকতা বিবেচনায় রেখে, এ গবেষণার পরিসর শুধু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে ২৯,৩৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৫৮,৯০৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২,১৯৭,৫৫৪ জন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত- সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা ধারাটি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ববৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে, যার আওতায় আছে ৬৭.৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক। প্রায় ৩১.৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক রয়েছেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায়- মাত্র ০.৬ শতাংশ। শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায়ও একই চিত্র দেখা যায়। অর্থ্যাৎ সাধারণ শিক্ষা ধারায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে (৮২.৯ শতাংশ), তার পরের অবস্থানে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা (১৬.৯ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় (মাত্র ০.২ শতাংশ)। মাধ্যমিকস্তরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়, যদিও এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ শিক্ষকের মাসিক বেতন সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাত্র ১.২ শতাংশ সরাসরি সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমগ্রশিক্ষাব্যবস্থার মাত্র ২.৪ শতাংশ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা এখনো বিস্তৃত হচ্ছে। আট বছরের ব্যবধানে (২০০৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত) মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ৩.৭ শতাংশ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে ১৩.২ ও ৪৩.৪ শতাংশ করে। এর ফলে শিক্ষক-প্রতিষ্ঠান অনুপাতে সামান্য পরিবর্তন হলেও, শিক্ষার্থী-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সরকার সকল ধারার বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৮৩ শতাংশকে এবং শিক্ষকদের ৮৯ শতাংশেরও বেশি সংখ্যককে মাসিক আর্থিক অনুদান ও বেতন ভাতা প্রদান করে। এটি সাধারণভাবে মান্থলি পে অর্ডার বা এমপিও নামে পরিচিত। গত পাঁচ বছরে এই আর্থিক অনুদান ২.৩ গুণ বেড়েছে; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৮৭,৯৪৩.৬ মিলিয়ন টাকা বা ১,০৪৭ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ।

খ. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এডুকেশন ওয়াচ-এর এ বছরের গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের অবস্থা জানা এবং শিক্ষার উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা নিরীক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিচের বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষকদের উন্নয়নে গৃহীত নীতিমালা;
- শিক্ষকদের সামাজিক, শিক্ষাগত, পেশাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা;
- শিক্ষাক্রম ও শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের বোধগম্যতা ও তাঁদের শিক্ষণ দক্ষতা;
- শিক্ষক সমিতির ভূমিকা ও কার্যাবলি;
- চতুর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষকদের অবস্থা; এবং
- শিক্ষকদের জীবন, দক্ষতা ও বোধগম্যতা সংশ্লিষ্ট বিবিধ অনুসঙ্গের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক।

সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতিসমূহের এক সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করে এ গবেষণার উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দলিলপত্র পর্যালোচনা, নমুনা জরিপ, সুগভীর সাক্ষাৎকার ও সুনির্দিষ্ট দলীয় আলোচনা। মাধ্যমিকস্তরের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এই গবেষণার সমগ্রক। ফলে নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ গবেষণার আওতায় এসেছে।

- সরকারি বিদ্যালয়,
- বেসরকারি বিদ্যালয়,
- স্কুল ও কলেজ,
- দাখিল মাদ্রাসা, এবং
- উচ্চতর মাদ্রাসা (আলিম, ফাযিল ও কামিল)

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)'র তৈরি করা নমুনায়ন কাঠামো ব্যবহার করে গবেষণাটির সংখ্যাবাচক অংশের নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথম ধাপে উপরের প্রত্যেক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১২০টি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে, প্রতিটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান থেকে, অনুমোদিত পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত স্থায়ী শিক্ষকদের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে, এই গবেষণায় ৬০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩,০০০ জন শিক্ষকের নিকট থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য শিক্ষক জরিপে একটি শিক্ষণ দক্ষতার প্রত্যক্ষণ পরিমাপক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণার গুণগত অনুসন্ধান করা হয় পাঁচটি উপজেলার দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে- যার আওতায় ৩০টি শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও ১০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ৩০ জন সহকারী শিক্ষকের সাথে সুগভীর সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে গবেষণার জন্য মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে গবেষণার নমুনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা				
	গ্রাম	শহর	মোট	পুরুষ	নারী	গ্রাম	শহর	মোট
সরকারি বিদ্যালয়	১৫	১০৫	১২০	৪৫২	১৪৮	৭২	৫২৮	৬০০
বেসরকারি বিদ্যালয়	১০১	১৯	১২০	৪৫২	১৪৮	৫০৪	৯৬	৬০০
স্কুল ও কলেজ	৮৩	৩৭	১২০	৪৪৩	১৫৭	৪১৫	১৮৫	৬০০
দাখিল মাদ্রাসা	১০৩	১৭	১২০	৪৯৬	১০৪	৫১৫	৮৫	৬০০
উচ্চতর মাদ্রাসা	৯২	২৮	১২০	৪৮৬	১১৪	৪৬০	১৪০	৬০০
মোট	৩৯৪	২০৬	৬০০	২,৩২৯	৬৭১	১,৯৬৬	১,০৩৪	৩,০০০

গ. শিক্ষক উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিমালা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি শিক্ষক নিয়োগে প্রধান ভূমিকা পালন করে। প্রার্থীদের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আয়োজিত একটি নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ইউনেস্কো সুপারিশকৃত শিক্ষক অনুজ্ঞাপত্র ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ নিবন্ধন পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে প্রণীত ড.কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। কমিশন মনে করেছিল, অন্য যেকোনো পেশার মতো শিক্ষকতার জন্যও যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে গঠিত আরেকটি শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনে বলা হয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য চাকরি পূর্ব ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রচলন করা উচিত। তারও পরে দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে ২০১০ সালে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়, এই প্রশিক্ষণগুলো অত্যন্ত সনাতন ঘরানার, অপর্যাপ্ত, সনদ-নির্ভর, ও তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুতে ভারাক্রান্ত। শিক্ষকতা পেশার পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে তাই শিক্ষানীতিতে সুপারিশ করা হয়।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্রে শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও সুবিধাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আয় ও অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রে পরিষ্কার ব্যবধান লক্ষণীয়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতাও বাৎসরিক আয়বৃদ্ধির মতো সুবিধাদি ভোগ করেন। এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু সুবিধা যেমন- টিফিন ভাতা, বিশ্রাম ও বিনোদন ভাতা, টাইম স্কেল, বেতন বৃদ্ধি ও পেনশন কেবল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যই প্রযোজ্য। শিক্ষকদের বেতন ও সুবিধাদি নির্ধারণে ইউনেস্কো কতগুলো মৌলিক নীতি অনুসরণের প্রস্তাব করেছে; এর মধ্যে রয়েছে- জাতীয় আয়ের স্তর, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান, সমসাময়িক অন্যান্য পেশা ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের রাজস্ব সামর্থ্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই এ নীতি পর্যাপ্তভাবে অনুসরণ করা হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একটা নির্দিষ্ট সময় পর শিক্ষকদের গ্রেড উন্নীত হয়- যার ফলে তাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি কিছুটা বাড়ে, কিন্তু তাঁদের পদবিতে কোনো পরিবর্তন হয় না; অর্থাৎ তাঁরা সেই সহকারী শিক্ষকই থেকে যান। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির প্রক্রিয়া আরও শোচনীয়। শিক্ষকদের যোগ্যতা বিবেচনা করে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ সুপারিশ করা হয়েছে।

ঘ. নমুনাভুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। প্রতিষ্ঠানগুলোর ১.১ শতাংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশ শতকে (১৮৩২-১৯০০), ১০.৭ শতাংশ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত সময়ে (১৯০১-১৯৪৭), ২৪.১ শতাংশ পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১), ২৯.১ শতাংশ বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকে (১৯৭২-১৯৯০) এবং বাকি ৩৫ শতাংশ সাম্প্রতিক সময়ে (১৯৯১-২০১৬)।

- গ্রামীণ এলাকার ৩৮ শতাংশ ও শহর এলাকার এক-চতুর্থাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাদ্রাসা ও ৬০ শতাংশের কিছু কম মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাংলাদেশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি বিদ্যালয়গুলো অপেক্ষাকৃত আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাকি চার ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ (৮৭.৮ শতাংশ) সরকারের আর্থিক অনুদান পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে, ৯৪.২ শতাংশ

বেসরকারি বিদ্যালয়, ৯০ শতাংশ স্কুল ও কলেজ, ৯৮.৩ শতাংশ উচ্চতর মাদ্রাসা এবং ৬৭.৫ শতাংশ দাখিল মাদ্রাসা এই অনুদান পাচ্ছে।

- নমুনাভুক্ত ৯১.৬ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলের পড়ালেখার ব্যবস্থা রয়েছে, ৭.১ শতাংশ শুধু মেয়েদের জন্য এবং ১.৩ শতাংশ শুধু ছেলেদের জন্য। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগে শুধু ছেলেদের পড়ালেখার ব্যবস্থা আছে; পক্ষান্তরে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য উন্মুক্ত। শুধু মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুপাত আগের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ আমলে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৮ থেকে ৪,৭৭৫ জন। গড়ে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি- ৯০০ জন। তার পরের স্থানেই রয়েছে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা (৭৯৫ জন)। বেসরকারি বিদ্যালয়ে গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৬৪ জন এবং উচ্চতর ও দাখিল মাদ্রাসায় যথাক্রমে ২৭৩ ও ২১০ জন। সার্বিকভাবে মোট শিক্ষার্থীর ৫২.৯ শতাংশ মেয়ে।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষকদের সংখ্যা ৫ থেকে ৮৪ জন এক-চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ১২ জন করে, ১৮.৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ১১ জন করে এবং ১১.৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ১০ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। সরকারি বিদ্যালয়ে গড়ে ২৫.৫ জন স্থায়ী শিক্ষক থাকলেও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা ১০-১৪ জন। প্রতিষ্ঠানগুলোতে গড়ে ১৩.৪টি অনুমোদিত পদ রয়েছে, সেগুলোর বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে গড়ে ১১.৬টি পদ পুরণ করা হয়েছে। অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানপ্রতি গড় শিক্ষক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩.৫ জনে। মোট শিক্ষকদের এক-চতুর্থাংশ নারী। সরকারি বিদ্যালয় এবং স্কুল ও কলেজে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক নারী। অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় মাদ্রাসায় নারী শিক্ষক অনেক কম- মাত্র ১৮ শতাংশ।

অনুমোদিত পদ ও নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের গড় সংখ্যা এবং এদের শতকরা ব্যবধান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	গড়				বেশি বা কম (%)[১]
	অনুমোদিত পদ	স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক	অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক	মোট শিক্ষক	
সরকারি বিদ্যালয়	৩১.৭	২৫.৫	১.৭	২৭.১	-১৪.৫
বেসরকারি বিদ্যালয়	১৩.২	১১.৫	২.৩	১৩.৮	+৪.৮
স্কুল ও কলেজ	১৬.০	১৪.৩	৪.০	১৮.৩	+১৪.১
দাখিল মাদ্রাসা	১২.০	১০.০	০.৯	১০.৯	-৯.৯
উচ্চতর মাদ্রাসা	১২.১	১০.৪	০.৯	১১.৩	-৫.৯
মোট	১৩.৪	১১.৬	১.৯	১৩.৫	+০.৭

১ অনুমোদিত পদের সঙ্গে মোট শিক্ষকের তুলনা

- প্রতিজন স্থায়ী শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা গড়ে ৪৬ জন। অস্থায়ীভিত্তিতে কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করায় এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ জনে। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত পাওয়া গেছে স্কুল ও কলেজে; এর পর রয়েছে যথাক্রমে বেসরকারি বিদ্যালয়, সরকারি বিদ্যালয়, উচ্চতর মাদ্রাসা এবং দাখিল মাদ্রাসা। অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের আগে ৫৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৪০ঃ১ এর বেশি ছিল; অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগদানের পরও ৩৯.৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে এই অনুপাত রয়ে গেছে।

ঙ. শিক্ষকবৃন্দও তাঁদের পরিবার

- নমুনায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের বয়স ২১ থেকে ৬০ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত; গড়ে ৪২.২ বৎসর। তাঁদের ৯৪ শতাংশেরও বেশি বিবাহিত, ১৭.৮ শতাংশ অমুসলিম এবং ১.৫ শতাংশ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকদের পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা ৪.২ জন। সার্বিকভাবে ১২.৫ শতাংশ শিক্ষক ছিলেন প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী অর্থ্যাৎ তাঁদের মা-বাবার কেউই পড়ালেখা করেননি। এই হার দাখিল মাদ্রাসায় ১৬.৩ শতাংশ, উচ্চতর মাদ্রাসায় ১৪.৭ শতাংশ, বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১১.৩ শতাংশ, স্কুল ও কলেজে ৯ শতাংশ এবং সরকারি বিদ্যালয়ে ৫ শতাংশ।

- শিক্ষকদের স্ত্রী বা স্বামীদের ১৯.৩ শতাংশের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে, ২৫.৫ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অতিক্রম করেছেন ২০.৭ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সম্পূর্ণ করেছেন ১৯.৮

শতাংশ এবং ১৪.৬ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের নিচে কোনো শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্ত্রী বা স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের স্ত্রী বা স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে বেশি। শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরীখে পরবর্তী স্থানে রয়েছে যথাক্রমে স্কুল ও কলেজ, বেসরকারি বিদ্যালয়, উচ্চতর মাদ্রাসা এবং দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের স্ত্রী বা স্বামীরা।

- তিপ্পান্ন শতাংশেরও বেশি শিক্ষকের পরিবারে অন্তত একজন সদস্য আছেন যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমন সদস্যদের মধ্যে ১১.৮ শতাংশ তাঁদের বাবা-মা, ১৯.১ শতাংশ বড় ভাই-বোন, ১৮.৯ শতাংশ ছোট ভাই-বোন, ২৩.৭ শতাংশ স্বামী-স্ত্রী, এবং ২.১ শতাংশ সন্তান। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারি বিদ্যালয়ের ৬৮.৮ শতাংশ শিক্ষকের পরিবারে অন্তত আরও একজন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। এই হার স্কুল ও কলেজ, বেসরকারি বিদ্যালয়, উচ্চতর মাদ্রাসা এবং দাখিল মাদ্রাসায় যথাক্রমে ৫৬.৩, ৫৫.২, ৫৩.৭ এবং ৪৩.৮ শতাংশ। এ ধরনের পরিবার নারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া গেছে (৬৬.১ শতাংশ বনাম ৪৯.৪ শতাংশ)। মাদ্রাসার তুলনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিবারে এমন সদস্য বেশি দেখা গেছে- যথাক্রমে ৪৭.৯ ও ৫৫.৭ শতাংশ।

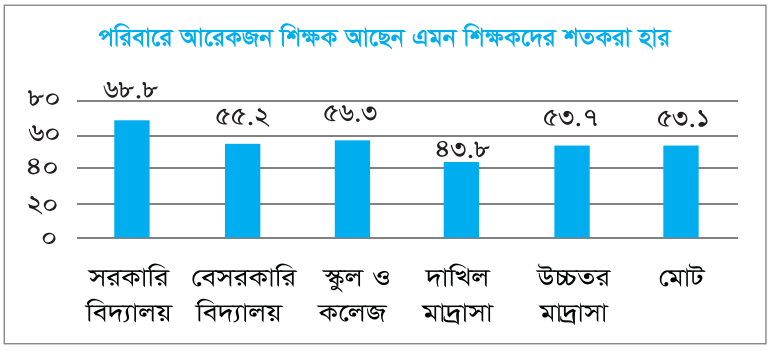

পরিবার বলতে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ও সন্তানদের বোঝানো হয়েছে

চ. শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। নমুনাভুক্ত শিক্ষকদের ৪৮.৮ শতাংশ বিবিধ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, ৪৮.২

শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী, আর বাকি ৩ শতাংশ উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। তিন-চতুর্থাংশের বেশি শিক্ষক সাধারণ ধারার অধীনে পড়ালেখা করেছিলেন, এক-তৃতীয়াংশ মাদ্রাসা ধারায় এবং অবশিষ্ট শিক্ষকরা উভয় ধারাতেই শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকদের অনুপাত বিদ্যালয়ের তুলনায় (১১.৭ শতাংশ) মাদ্রাসায় (৪৭.৩ শতাংশ) বেশি।

- শিক্ষকদের একটি বড় অংশ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (৮২.৬ শতাংশ) থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ৫.৩ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ৫.২ শতাংশ, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ২৪.৪ শতাংশ, স্নাতক স্তরে ৪৪.৯ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ৫৮.৯ শতাংশ শিক্ষক সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছিলেন এমন শিক্ষকদের হার মাদ্রাসার তুলনায় বিদ্যালয়ে বেশি।

- বেশিরভাগ শিক্ষক তাঁদের শিক্ষাজীবনে মানবিক শাখায় অধ্যয়ন করেছিলেন। মাধ্যমিকস্তরে মানবিক শাখায় পড়ালেখা করা শিক্ষকদের হার ছিল ৪৯.১ শতাংশ, যা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৭৪.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। স্বাভাবিকভাবে, এর বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা গেছে বিজ্ঞান শাখায় পড়ালেখা করার ক্ষেত্রে- ৪৫.৪ শতাংশ শিক্ষক মাধ্যমিকস্তরে বিজ্ঞান শাখায় পড়ালেখা করলেও তা পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর স্তরে এসে ১৭.১ শতাংশে নেমে গেছে। প্রায় ৫৮ শতাংশ শিক্ষক প্রথম তিনটি সর্বজন পরীক্ষার (মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক) প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ অর্জন করেছিলেন, স্নাতকোত্তরসহ চারটি পরীক্ষা বিবেচনায় নিলে এই হার ৩৩.২ শতাংশে নেমে যায়।

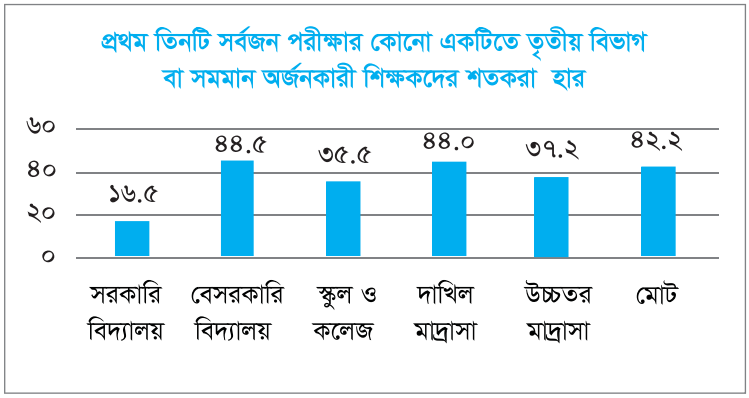

- দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণ রয়েছে। এগুলো হলো, ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড), মাস্টার অব এডুকেশন (এমএড), ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) ও ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড)। পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাদ্রাসা শিক্ষকদের তুলনায় বেশ এগিয়ে আছেন (যথাক্রমে ৭৯.৪ ও ৩৯.৫ শতাংশ)। এ ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকরা পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় এগিয়ে আছেন (যথাক্রমে ৭৬.৯ ও ৬২.৯ শতাংশ)।

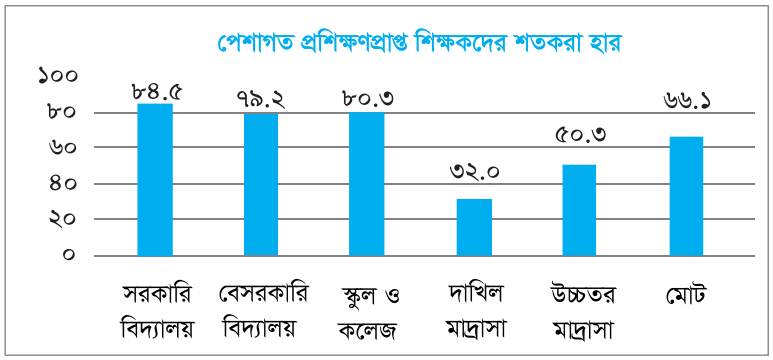

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষভাবে ২০১১ সাল থেকে মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষকরা বেশকিছু বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। সামগ্রিকভাবে, ৭৮.২ শতাংশ শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ৮৩.৬ শতাংশ শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, বাংলা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের তুলনায় শিক্ষকদের মাঝে গণিত, ইংরেজি এবং ধর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ার হার বেশি।

- সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি (সিকিউ), শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (টিসিজি), পাঠদানের মানোন্নয়ন (টিকিউআই), জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (এলএসবিই), এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। এই কোর্সগুলোর কোনোটিই মাধ্যমিক স্তরের এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষকের কাছে পৌঁছায়নি।

পড়ানোর বিষয় অনুসারে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শতকরা হার

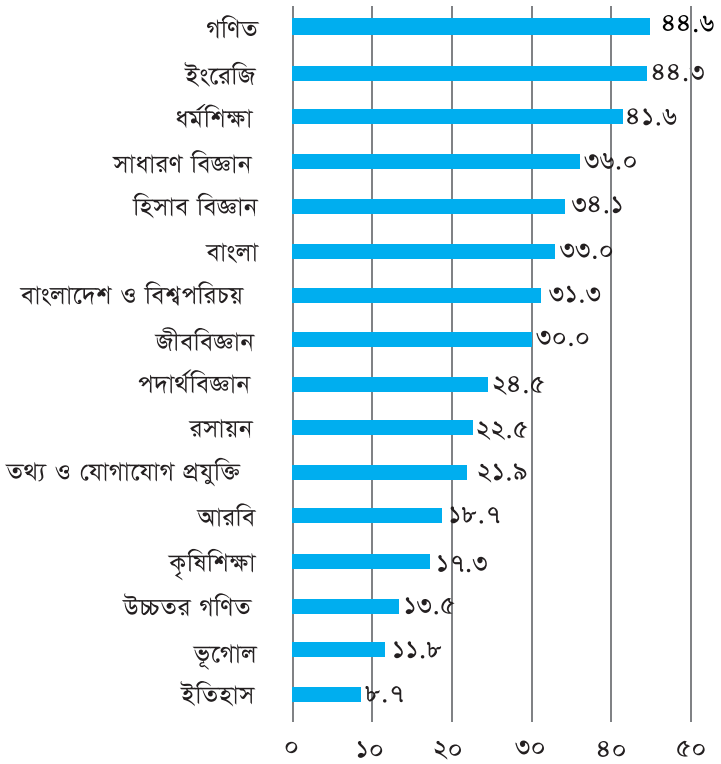

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে এসব প্রশিক্ষণের একটি মিশ্র প্রভাব লক্ষ করা গেছে। শিক্ষকদের একটি অংশ জানিয়েছেন, তাঁরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন। তবে, অন্য একটি অংশ এ ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবহার না করার কারণ হিসেবে বিদ্যালয়ের নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন অথবা নিজেদেরই দোষারোপ করেছেন।

ছ. পেশা নির্বাচন, আয় ও কর্ম-সন্তুষ্টি

- জীবনের লক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করায় নমুনাভুক্ত শিক্ষকরা বিবিধ ধরনের উত্তর করেছেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৫৮.৭ শতাংশ) যদিও শিক্ষকতাই করতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন, বাকিরা ডাক্তার, প্রকৌশলী, সরকারি

চাকুরে, পুলিশ বা প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যাংকার, অথবা ব্যবসায়ী হতে চেয়েছিলেন। শিক্ষকদের ক্ষুদ্র এক অংশের (৩.৩ শতাংশ) জীবনে কোনো লক্ষ্য ছিল না। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী নারী শিক্ষক যাদের বড় ভাই বা বোন শিক্ষকতা পেশায় ছিলেন এবং বাবা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করতে পারেননি- এদের মধ্যে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষকতা পেশাকে নির্ধারণ করার প্রবণতা অন্য শিক্ষকদের তুলনায় বেশি দেখা গেছে।

জীবনের লক্ষ্য অনুসারে শিক্ষকদের শতকরা বিন্যাস

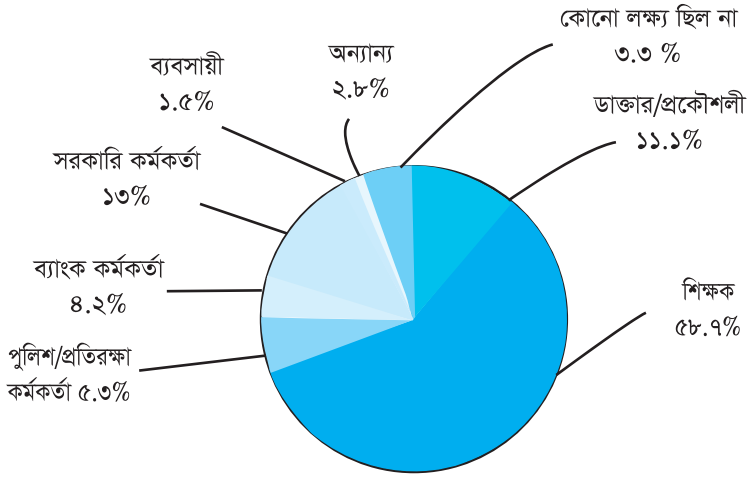

- নমুনাভুক্ত শিক্ষকদের ৫৩.২ শতাংশের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করাই ছিল প্রথম পেশা। এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষক এর আগেও অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছিলেন, ১৬.৫ শতাংশ অন্য পেশা থেকে শিক্ষকতায় এসেছেন, এবং ১০ শতাংশ শিক্ষক বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানের আগে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। সরকারি বিদ্যালয়ের ৬৪.৪ শতাংশ, বেসরকারি বিদ্যালয় এবং স্কুল ও কলেজের ৫০ শতাংশ, এবং মাদ্রাসার ৪০ শতাংশ শিক্ষকের ক্ষেত্রে এটি (শিক্ষকতা) তাঁদের দ্বিতীয় চাকরি। বর্তমান পেশায় যোগদানের আগে সরকারি বিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষক বেসরকারি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন; বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩০ শতাংশ শিক্ষক অন্য কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে এসেছেন।

- নমুনার এক-চতুর্থাংশ শিক্ষক আট বৎসর বা তারও কম সময়ব্যাপী শিক্ষকতা পেশায় রয়েছেন। দ্বিতীয় এক-চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে তা ৯-১৬ বৎসর, তৃতীয় এক-চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে ১৭-২২ বৎসর এবং চতুর্থ চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে ২৩-৪০ বৎসর। গড়ে শিক্ষকদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল ১৬.৩ বৎসরের যার আদর্শ বিচ্যুতির মান ৯ বৎসর।

- নমুনাভুক্ত সব শিক্ষকই প্রধান পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে উল্লেখ করলেও দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক জানিয়েছেন যে, তাঁদের দ্বিতীয় একটি পেশাও রয়েছে। পুরুষ শিক্ষকদের ৩৯.৭ শতাংশ ও নারী শিক্ষকদের ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে শিক্ষকতাই হচ্ছে একমাত্র পেশা। শিক্ষকদের এক-পঞ্চমাংশ দ্বিতীয় পেশা হিসেবে গৃহ-ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন; এটি আবার নারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৮৬ শতাংশ। শিক্ষকদের ২৩.২ শতাংশের দ্বিতীয় পেশা কৃষিকাজ, ১১.৩ শতাংশের গৃহশিক্ষকতা, আর ব্যবসা, মৎস্যচাষ ও অন্যান্য পেশার কথা বলেছেন যথাক্রমে ৪.৪, ২.৮ ও ৫.৭ শতাংশ শিক্ষক। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৫৭.৮ শতাংশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের একমাত্র পেশা শিক্ষকতা।

দ্বিতীয় পেশার ধরন অনুসারে শিক্ষকদের শতকরা বিন্যাস

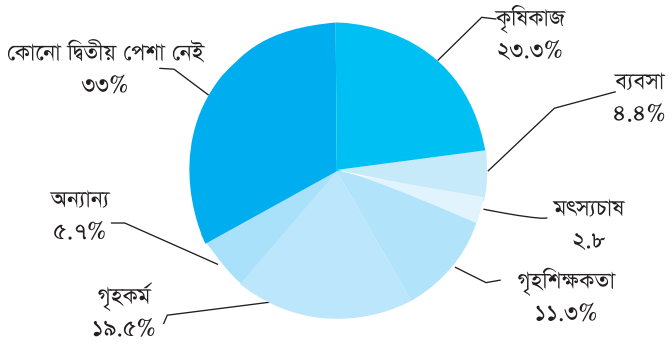

- শিক্ষকদের গড় বার্ষিক আয় ২৭৩,৬৭২ টাকা যার ৮৫.৫ শতাংশই আসে তাঁদের প্রধান পেশা শিক্ষকতা থেকে। শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক আয়-বৈষম্য রয়েছে। যে এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষক সবচেয়ে বেশি আয় করেন তাঁদের গড় আয় সবচেয়ে কম আয় করেন এমন এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষকের গড় আয়ের প্রায় ৩.৫ গুণ। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আয় সবচেয়ে বেশি। তাঁদের আয় সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) শিক্ষকদের

আয়ের ১.৯ গুণ আর সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নন এমন শিক্ষকদের আয়ের ৩.৮ গুণ। গত এক বছরের সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ করে ৫ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন- তাঁরা সব সময়ই অভাবে ছিলেন, ২০.২ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন তাঁরা মাঝে মাঝে অভাবে ছিলেন, ৩৪.৯ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন তাঁরা খেয়ে-পরে সমান ছিলেন, আর ৪০ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন বছরের সব খরচ মিটিয়ে তাঁদের কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। শিক্ষকদের বাৎসরিক আয়ের সাথে তাঁদের এই খাদ্য-নিরাপত্তা অবস্থার একটা ইতিবাচক সহ-সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে।

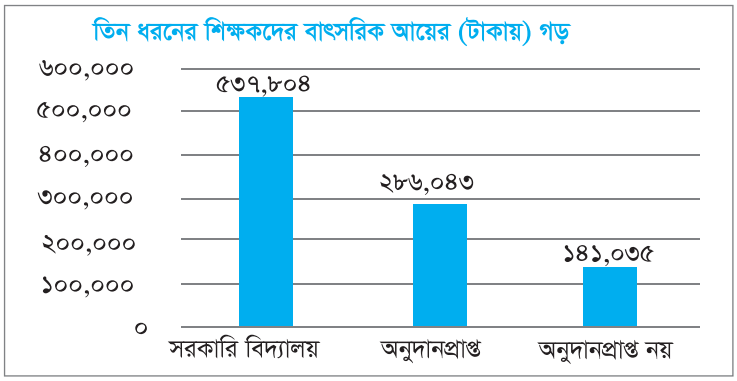

- পেশা এবং প্রতিষ্ঠান নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষক সন্তোষ প্রকাশ করলেও সম্মানী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তা করেননি। তাঁদের পেশা, প্রতিষ্ঠান ও প্রাপ্ত সম্মানী এই তিনটি ক্ষেত্রেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ২৬.৩ শতাংশ শিক্ষক। পেশা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে সন্তুষ্ট কিন্তু সম্মানী নিয়ে সন্তুষ্ট নন এমন শিক্ষকের অনুপাত ৪৬.৪ শতাংশ। পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট কিন্তু প্রতিষ্ঠান কিংবা সম্মানী নিয়ে নন এমন শিক্ষকের অনুপাত ১৬ শতাংশ।

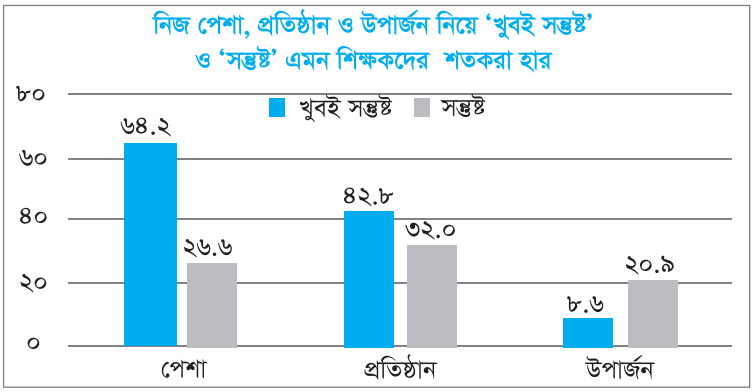

- নিজ পেশা, প্রতিষ্ঠান ও সম্মানী এই তিনটি ক্ষেত্রেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এমন শিক্ষক সবচেয়ে বেশি আছেন সরকারি বিদ্যালয়ে- প্রায় ৫৫ শতাংশ। স্কুল ও কলেজে এমন শিক্ষক ৩০.২ শতাংশ, উচ্চতর মাদ্রাসায় ২৭ শতাংশ, বেসরকারি বিদ্যালয়ে ২৬.৩ শতাংশ, এবং দাখিল মাদ্রাসায় ২১ শতাংশ। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক তাঁদের বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং ৫.২ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষকতা পেশা পরিবর্তন করে অন্য কোনো পেশায় চলে যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

জ. শিক্ষকতা, কর্মভার ও শ্রেণি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান

- নমুনাভুক্ত শিক্ষকদের সবাই মাধ্যমিকস্তরের সব শ্রেণিতে পাঠদান করেন না। তাঁদের ৬৩ শতাংশ ষষ্ঠ শ্রেণিতে, ৭১.১ শতাংশ সপ্তম শ্রেণিতে, ৮৩.৪ শতাংশ অষ্টম শ্রেণিতে ও ৯০ শতাংশেরও বেশি নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠদান করেন। শিক্ষকরা গড়ে ৩.৩টি বিষয়ে পাঠদান করেন- এটি সর্বনিম্ন একটি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ নয়টি বিষয় পর্যন্ত হতে পারে। রুটিন অনুসারে শিক্ষকদের প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২৩.৭টি পিরিয়ডে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়, যাতে মোট সময় লাগে ১৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট। এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষক সপ্তাহে ১৮ বা তার চেয়ে কম সংখ্যক পিরিয়ড পরিচালনা করেন, আরেক পঞ্চমাংশ শিক্ষক সপ্তাহে ২৮টির বেশি পিরিয়ড পরিচালনা করেন। বাকি ৬০ শতাংশ শিক্ষক সপ্তাহে ১৯-২৭টি পিরিয়ড পরিচালনা করেন। সপ্তাহে এতগুলো পিরিয়ড পরিচালনা করাকে শিক্ষকরা অতিরিক্ত কাজের চাপ হিসেবে দেখছেন, তাই তাঁরা ২১.৫ শতাংশ কাজের চাপ কমানোর প্রস্তাব করেছেন।

শিক্ষকদের সাপ্তাহিক কাজের চাপ ও এসংক্রান্ত প্রত্যাশা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	বর্তমান রুটিন অনুসারে		শিক্ষকদের চাহিদা	
	গড় পিরিয়ড সংখ্যা	ঘণ্টা	গড় পিরিয়ড সংখ্যা	বর্তমানের চেয়ে কম (%)
সরকারি বিদ্যালয়	২১.০	১৫.১৫	১৬.৮	২০.০
বেসরকারি বিদ্যালয়	২২.৭	১৬.০০	১৮.০	২০.৭
স্কুল ও কলেজ	২২.২	১৬.০০	১৮.১	১৮.৫
দাখিল মাদ্রাসা	২৬.৩	১৬.৪০	১৯.৯	২৪.৩
উচ্চতর মাদ্রাসা	২৫.২	১৬.১৫	১৯.৯	২১.০
মোট	২৩.৭	১৬.১০	১৮.৬	২১.৫

- সার্বিকভাবে, ৫৭.৩ শতাংশ শিক্ষক রুটিন তৈরি ও শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়সহ কাজ বণ্টনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। প্রায় ২৯ শতাংশ শিক্ষক এই প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও তাঁদের সাথে রুটিন চূড়ান্ত করার আগে কথা বলা হয়েছিল এবং ১৩.৭ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন যে, রুটিন তৈরিতে তাঁদের কোনো ভূমিকা ছিল না। রুটিন তৈরি প্রক্রিয়ায় নারী শিক্ষকদের চেয়ে পুরুষ শিক্ষকরা বেশি অংশগ্রহণ করেছেন। অবশ্য বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য দেখা যায়নি। অধিকাংশ শিক্ষক রুটিন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য নানাভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষকদের ৪৩.৭ শতাংশ দাবি করেছেন যে তাঁরা নিজেরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করেন, ৩৬.৮ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন প্রশ্নপত্র কেনা হয় শিক্ষক সমিতি থেকে, ১৪.৪ শতাংশ শিক্ষক খোলা বাজার থেকে প্রশ্নপত্র কেনার কথা জানিয়েছেন এবং ১০.৩ শতাংশ শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষকদের দ্বারা প্রশ্নপত্র তৈরি করার কথা বলেছেন। নিজেরা প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন এমন শিক্ষকদের হার সবচেয়ে বেশি সরকারি বিদ্যালয়ে (৭৬.৮ শতাংশ)। এছাড়া স্কুল ও কলেজের ৫৩.৫ শতাংশ, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৪৪.৩ শতাংশ, উচ্চতর মাদ্রাসার ৪২.৮ শতাংশ এবং দাখিল মাদ্রাসার ৩৫.৮ শতাংশ শিক্ষক নিজেরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন বলে জানিয়েছেন।

- দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা মূলত অষ্টম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য। এমন চর্চা স্কুল ও কলেজ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বেশি (৭০ শতাংশ) দেখা গেছে। এর পরের স্থানেই রয়েছে উচ্চতর এবং দাখিল মাদ্রাসাগুলো- যাদের ৬০ শতাংশে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা লক্ষ করা গেছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ৩৫.৮ শতাংশ অষ্টম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করেছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষক এ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ৬৪ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক রুটিন কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে এটি অনুষ্ঠিত হয়, ১৭.৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে হয় ছুটির পর, ছুটির দিনে ১৫.৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে এবং রুটিন কার্যক্রম চলাকালে ৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত পাঠদান করা হয়।

- আটাত্তর শতাংশেরও বেশি শিক্ষক জানিয়েছেন যে গত তিন মাসে অন্তত একবার কেউ না কেউ তাঁদের শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য এসেছিলেন। শিক্ষকদের জেন্ডার বা প্রতিষ্ঠানের এলাকাভেদে এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য দেখা না গেলেও বিদ্যালয় অপেক্ষা মাদ্রাসার শিক্ষকদের শ্রেণি তত্ত্বাবধান কম করা হয়েছে (৮০.১ শতাংশ বনাম ৭৪.৪ শতাংশ)। শ্রেণিকার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দিক থেকে স্কুল ও কলেজ সবচেয়ে এগিয়ে (৮৩.৭ শতাংশ) আর দাখিল মাদ্রাসা সবচেয়ে পিছিয়ে (৭২.২ শতাংশ)। শ্রেণিকার্যক্রম তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে সবচেয়ে সক্রিয় হচ্ছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ। তাঁরা ৫৭.৪ শতাংশ শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন। তাঁরা ছাড়া অন্য তত্ত্বাবধানকারীদের মধ্যে আছেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধানগণ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা। যিনিই শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন না কেন, পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে কোনো মন্তব্য না করার বা ফলাবর্তন না দেওয়ার একটা সাধারণ চর্চা লক্ষ করা গেছে। পর্যবেক্ষণ থেকে লিখিত মন্তব্য কদাচিৎ দেওয়া হতো। মৌখিকভাবে যাঁরা মন্তব্য দিয়েছেন তাঁদের মন্তব্যগুলোও খুবই সাদামাটা ধরনের, মোটেও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম বা শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত নয়।

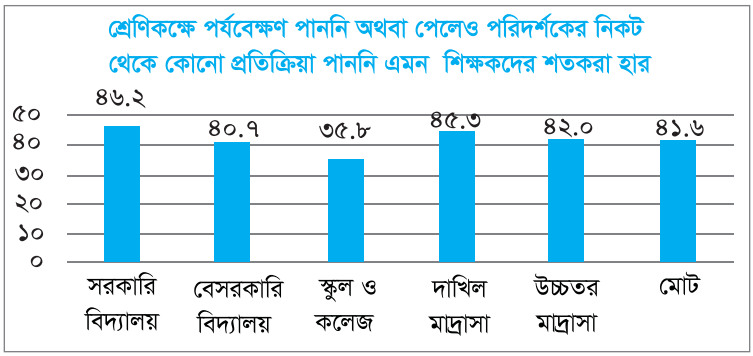

ঝ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন

- বিষয় ও প্রসঙ্গ নির্বিশেষে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মূল পদ্ধতি হচ্ছে একতরফা বক্তৃতা। পূর্ববর্তী পাঠ বা কোনো সূচনা বক্তব্যের সাথে সংযোগসাধন না করেই শিক্ষকরা দিনের আলোচ্য বিষয়টিতে কথা বলা শুরু করেন। জাতীয় ঐতিহ্য বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে আলোচনা

করার সময় কোনো প্রেরণা বা উৎসাহমূলক শব্দ বা বাক্য চয়ন করতে তাঁদের দেখা যায়নি। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত না করে একমুখী বক্তৃতাপ্রদান হচ্ছে পাঠদানের সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। যার ফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের খুব কমই প্রশ্ন করতে দেখা গেছে। শ্রেণির দলপতিদের (ক্যাপ্টেন) শুধু শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা গেছে। পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন আসতে পারে, মূলত সেসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর সনাক্ত করাই হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের মূল কর্মকাণ্ড। বাড়ির কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্যও একই। শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার সামর্থ্যের ওপর শিক্ষকদের বেশি সন্তুষ্ট থাকতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে, শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার খুব কমই হয়েছে, আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া সামগ্রীর ব্যবহারও তেমন একটা দেখা যায়নি। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেসব প্রশ্ন করেন যেগুলো মূলত মুখস্ত নির্ভর।

ঞ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, গণমাধ্যম এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার

- গবেষণাভুক্ত ৩১ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ পাওয়া গেছে কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি ল্যাব পাওয়া যায়নি, ৫.২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রযুক্তি ল্যাব আছে কিন্তু মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ নেই, ২২.৫ শতাংশে উভয়ই আছে এবং ৪১.৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে এর কোনোটিই নেই। এসব সুবিধা সৃষ্টির দিক থেকে সরকারি বিদ্যালয় এবং স্কুল ও কলেজগুলো অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে, আর দাখিল মাদ্রাসাগুলোর অবস্থান সবার নিচে।

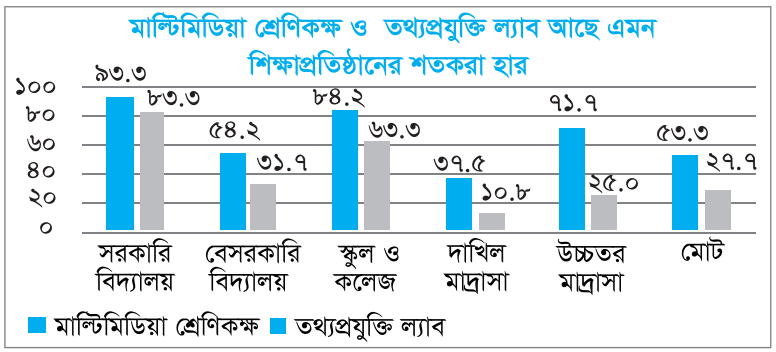

- প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষকের সাধারণ মোবাইল ফোন, ৬৪.৩ শতাংশের স্মার্ট ফোন বা ট্যাবলেট কম্পিউটার এবং ২৯.৩ শতাংশের ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ

কম্পিউটার আছে। পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় নারী শিক্ষকদের এবং গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তুলনায় শহরের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এধরনের সামগ্রী থাকার সম্ভাবনা বেশি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সাধারণ মোবাইল ফোন বেশি ব্যবহারে করেন। পক্ষান্তরে, বাকি সামগ্রীগুলোর ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে।

- শিক্ষকদের প্রত্যেকেই তাঁদের তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী কথা বলার জন্য ব্যবহার করেছেন; তাঁদের তিন-পঞ্চমাংশ আবার ক্ষুদেবার্তা বা এসএমএস করার কাজে এগুলো ব্যবহার করেছেন। আর যে উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে রয়েছে- ইন্টারনেট ব্রাউজিং (৫৭.৪ শতাংশ), ফটো/ভিডিওগ্রাফি (৫০.৭ শতাংশ), গান শোনা, নাটক দেখা ইত্যাদি (৪৮.৮ শতাংশ), মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান (৩৭.১ শতাংশ), ধর্মীয় প্রচারণা শোনা (৩৫.৭ শতাংশ), অর্থ স্থানান্তর/মোবাইল ব্যাংকিং (৩৪.৮শতাংশ), শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠসংক্রান্ত বিষয়বস্তু তৈরি (২৯.৪ শতাংশ), স্ব-অধ্যয়ন (২৪.৫ শতাংশ), পেশাসংক্রান্ত লেখালেখি (১৮ শতাংশ), খেলা (১৫ শতাংশ), এবং বেতারের অনুষ্ঠান শোনা (১৩.২ শতাংশ)।

- অর্ধেকের বেশি শিক্ষক পেশা-সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ব্যবহার করতেন। এ ক্ষেত্রে জেন্ডারভেদে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি, তবে গ্রামের তুলনায় শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং মাদ্রাসার তুলনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে ছিলেন। সরকারি বিদ্যালয়ের ৮১ শতাংশ, স্কুল ও কলেজের ৬৩.২ শতাংশ, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৫৪ শতাংশ, উচ্চতর মাদ্রাসার ৪৯.৩ শতাংশ এবং দাখিল মাদ্রাসার ৪০.৭ শতাংশ শিক্ষক পেশা সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ব্যবহার করার কথা জানিয়েছেন।

- প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ শিক্ষক ২০১৮ সালে কমপক্ষে একবার মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা জানিয়েছেন। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের এ হার পুরুষ ও নারী শিক্ষকদের মধ্যে যথাক্রমে ৩৯ ও ৪২.৫ শতাংশ, শহর ও গ্রামের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে যথাক্রমে ৫০.৯ ও ৩৭.১ শতাংশ, এবং বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে যথাক্রমে ৪৪.৬ ও ৩০.২ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, স্কুল ও কলেজের ৫৪.২ শতাংশ, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৪২.৭ শতাংশ, উচ্চতর মাদ্রাসার ৪০.৩ শতাংশ এবং দাখিল মাদ্রাসার

২৩.২ শতাংশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেছেন। যে শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ মধ্যম পর্যায়ের, যাঁদের নিজস্ব তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী আছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে- তাঁদের অন্য শিক্ষকদের তুলনায় শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি।

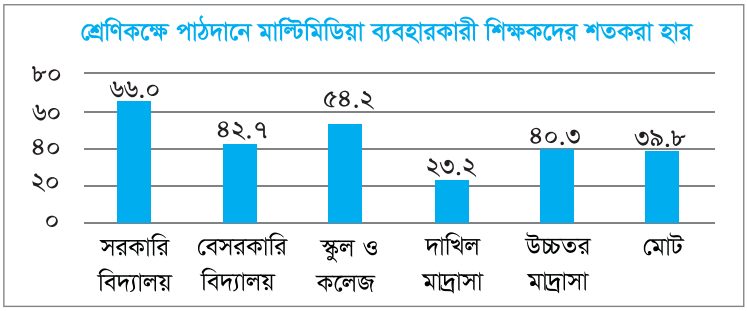

- এমন একটি বিষয়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি যেখানে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক পাঠদানে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেছেন। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হয়েছে এমন বিষয়গুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিসাববিজ্ঞান ও গণিত অন্য বিষয়গুলোর তুলনায় এগিয়ে, যার পরপরই ক্রমান্বয়ে ইংরেজি, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও বাংলা বিষয়ের অবস্থান। ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো, উচ্চতর গণিত, ইতিহাস এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের পাঠদানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার খুবই কম পাওয়া গেছে।

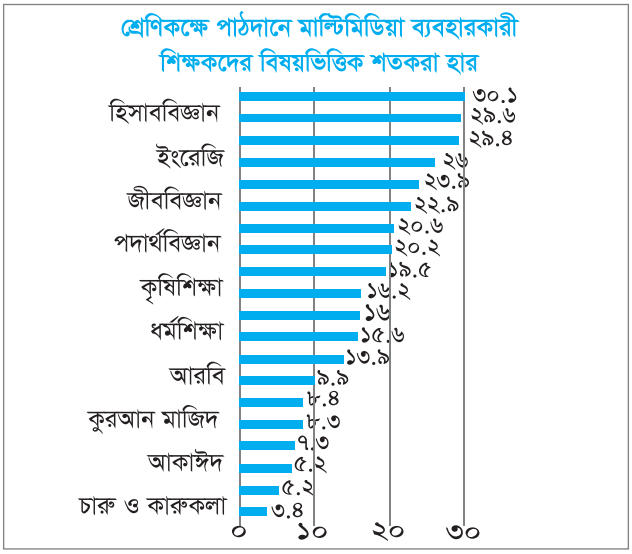

- দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে- বিদ্যুৎ বিভ্রাট, প্রশিক্ষণের অভাব, শ্রেণিকক্ষের অপ্রতুলতা, পর্যাপ্ত সরঞ্জামের অভাব, দক্ষতার অভাব, ত্রুটিযুক্ত সরঞ্জাম, প্রস্তুতিমূলক সময়ের অভাব এবং অকার্যকরী উপকরণ। যে শিক্ষকরা মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেননি তাঁরা নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটির কোনো ব্যবস্থা না থাকা, এ সম্পর্কে কোনো প্রশিক্ষণ না থাকা এবং ত্রুটিযুক্ত সরঞ্জাম থাকাকে প্রধান তিনটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ট. শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতার প্রত্যক্ষণ

- স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে মাত্র ০.৪ শতাংশ শিক্ষক নিজেদের *উচ্চপর্যায়ের দক্ষ* বলে মূল্যায়ন করেছেন; ১৫ শতাংশ *দক্ষ*, ৩৯.৮ শতাংশ *পরিমিত দক্ষ*, ২৭.৬ শতাংশ *গড়পড়তা দক্ষ*, ও ১৩.৭ শতাংশ নিজেদের *সীমিত পরিমাণে দক্ষ* হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। পক্ষান্তরে, ৩.৫ শতাংশ শিক্ষক নিজেদের *অদক্ষ* হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। সরকারি বিদ্যালয় এবং স্কুল ও কলেজের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষক নিজেদের *দক্ষ* বা *উচ্চপর্যায়ের দক্ষ* হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। উচ্চতর মাদ্রাসা, বেসরকারি বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে এ হার যথাক্রম ১৬.৮, ১৪.৮ ও ১৩.৬ শতাংশ। শিক্ষকদের জেন্ডারভেদে বা বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি।

আত্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত দক্ষতার স্তর অনুসারে
শিক্ষকদের শতকরা বিন্যাস

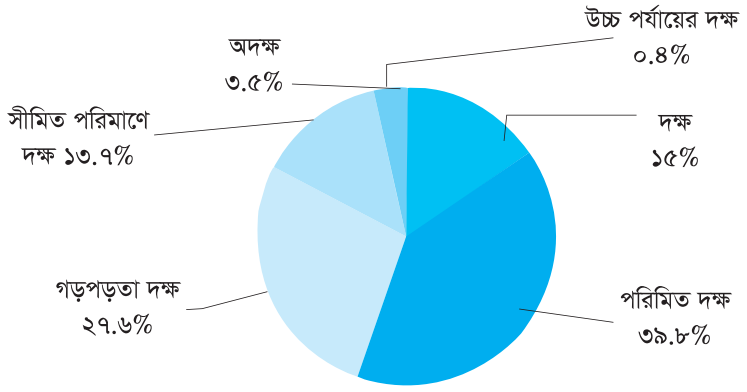

- দক্ষতার উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষকরা নিজেদের সবচেয়ে বেশি নম্বর দিয়েছেন পেশাগত উন্নয়ন অংশে (৯৩.৬ শতাংশ), যার পরই অবস্থান নৈতিকতা বিষয়ক অংশের (৮৮ শতাংশ)। তাঁরা নিজেদের সবচেয়ে কম নম্বর দিয়েছেন শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত অংশে (৬৯.৭ শতাংশ)। বাকি দুটি উপাদানের (প্রণোদনাসংক্রান্ত ও স্থিতিস্থাপকতা) নম্বর হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন নম্বরপ্রাপ্ত উপাদানগুলোর মাঝামাঝি।

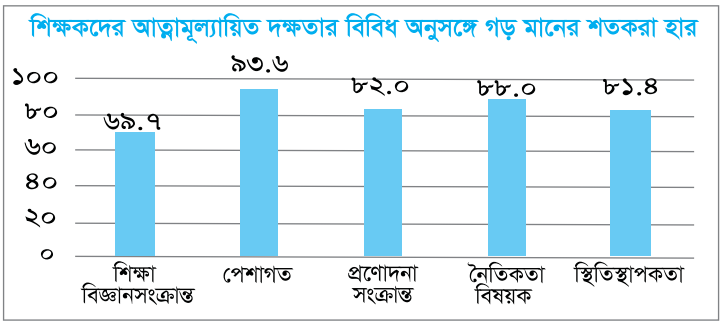

- গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়ের, অমুসলিম এবং নিজ প্রতিষ্ঠান নিয়ে সন্তুষ্ট এমন শিক্ষকরা অন্য শিক্ষকদের তুলনায় পরিমিত দক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সরকারি অনুদান পাওয়ার নিরিখে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি।

ঠ. গৃহশিক্ষকতায় অংশগ্রহণ ও গাইডবইয়ের ব্যবহার

- যদিও সরকার সব শিক্ষার্থীকে নিখরচায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে এবং শিক্ষণ-শিখন মূলত শ্রেণিকক্ষেই হওয়া উচিত; তৎসত্ত্বেও, শিক্ষকদের গাইডবই ব্যবহার করতে এবং গৃহশিক্ষকতায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। সামগ্রিকভাবে, ২২.৪ শতাংশ শিক্ষক গৃহশিক্ষকতায় অংশগ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন। তাঁরা গড়ে ২৩.৩ জন শিক্ষার্থীকে পড়াতেন। এই সংখ্যার নিরিখে গৃহশিক্ষকতায় অংশ নেওয়া শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ করা গেছে। তাঁরা ১ জন থেকে শুরু করে ২৩০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে পড়াতেন। গড় শিক্ষার্থীসংখ্যা থেকে যার আদর্শ বিচ্যুতি ৩৪ শতাংশ বেশি। শহরের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পুরুষ শিক্ষক, চাকরির মেয়াদ কম এবং কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছেন- অন্য শিক্ষকদের তুলনায় এই শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতায় নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

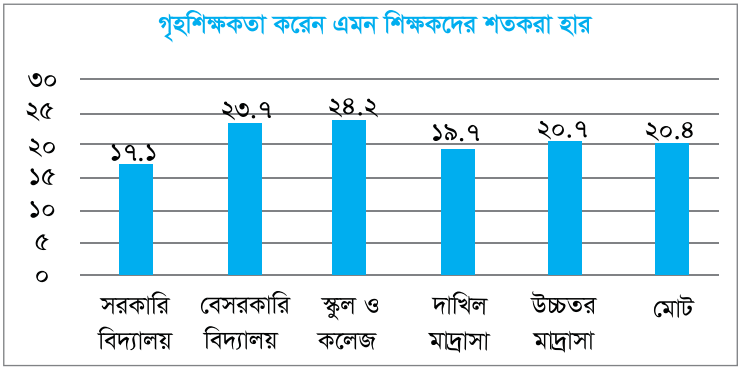

- গৃহশিক্ষকতার স্থান হিসেবে শিক্ষকদের ১৫.৪ শতাংশ নিজ বাড়িকেই বেশি পছন্দ করতেন। অন্যান্যের মধ্যে ৭.২ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষার্থীর বাড়িতে, ২.৮ শতাংশ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে এবং ০.৮ শতাংশ কোচিং সেন্টারে এই সেবা দিতেন। শিক্ষকদের একটি অংশ গৃহশিক্ষকতার জন্য উপর্যুক্ত একাধিক স্থান ব্যবহার করতেন।

- গৃহশিক্ষকতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ (৫৩.৮ শতাংশ) শিক্ষকদের নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। যদিও সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতার সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন, কিন্তু নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা শীর্ষে ছিলেন। গৃহশিক্ষকতার ক্ষেত্রে গণিতের শিক্ষকরা ছিলেন সবার শীর্ষে, ইংরেজি শিক্ষকরা ছিলেন তাঁদের ঠিক পরেই, আর এর পরেই ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়সমূহের শিক্ষকরা।

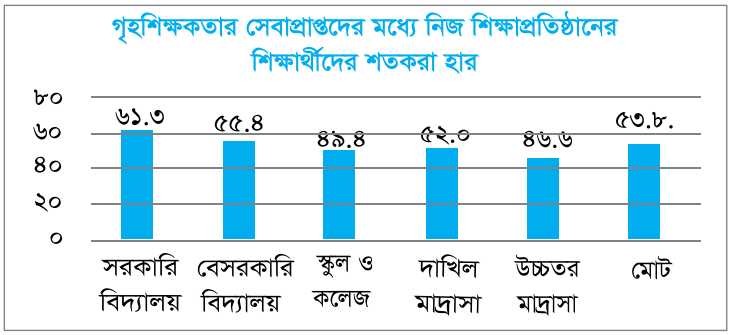

- সর্বোপরি, ৩৭.১ শতাংশ শিক্ষক গাইডবই ব্যবহার করতেন। নারী শিক্ষক, চাকরির মেয়াদ কম, মুসলিম এবং যাঁরা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাঁদের অন্য শিক্ষকদের তুলনায় গাইডবই ব্যবহার করার সম্ভাবনা বেশি।

যে শিক্ষকদের পিতা-মাতার কেউ শিক্ষকতা পেশায় ছিলেন না, তাঁদের তুলনায় যে শিক্ষকদের পিতা-মাতার কেউ না কেউ শিক্ষক ছিলেন তাঁদের গাইডবই ব্যবহার করার প্রবণতা খুব কম ছিল। শিক্ষকরা ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের জন্য মাধ্যমিকের সকল শ্রেণিতেই গাইডবই ব্যবহার করতেন। নবম ও দশম শ্রেণিতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও উচ্চতর গণিতের ক্ষেত্রে এবং মাদ্রাসার সকল শ্রেণিতে আরবি বিষয়ে গাইডবই ব্যবহারের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা গেছে।

ড. জাতীয় শিক্ষানীতি, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও চতুর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কিত জ্ঞান

- বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এরকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি সম্পর্কে মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষকদের স্পষ্ট ধারণা সাধারণভাবে পাওয়া যায়নি। পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে, শিক্ষকরা এধরনের নানাবিধ দলিলপত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম। নমুনাভুক্ত শিক্ষকদের ৮৫.৫ শতাংশ জানতেন যে, বাংলাদেশে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি রয়েছে, ৬৩.১ শতাংশ দাবি করেছেন যে নীতিটি তাঁরা পড়েছেন; তবে, শুধু ৪০.৬ শতাংশ এটি প্রবর্তনের সালটি বলতে পেরেছেন।

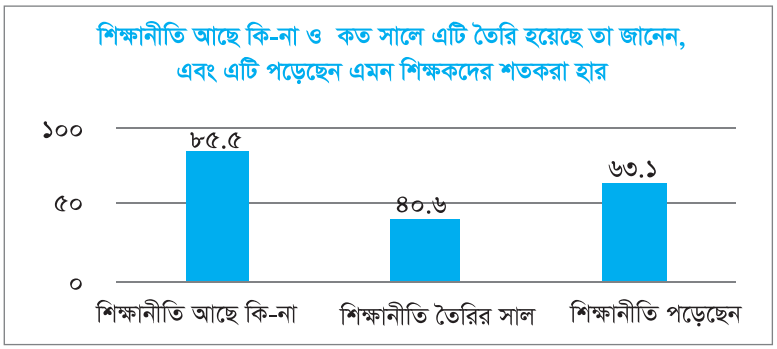

- বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রমের অস্তিত্ব সম্পর্কে ৮৬ শতাংশ শিক্ষক অবহিত, আর ৬২.৪ শতাংশ শিক্ষক এটি পড়েছেন বলে দাবি করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলে, ৪৩.১ শতাংশ শিক্ষক জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যগুলো ঠিকভাবে বলতে পেরেছেন এবং ১৮.৫ শতাংশ শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরিমার্জনের সালটি বলতে পেরেছেন।

শিক্ষাক্রম আছে কি-না, সর্বশেষ কতসালে পরিমার্জন করা হয়েছে,পড়েছেন কি-না, এবং পুরোপুরি বা আংশিক লক্ষ্যগুলো জানেন এমন শিক্ষকদের শতকরা হার

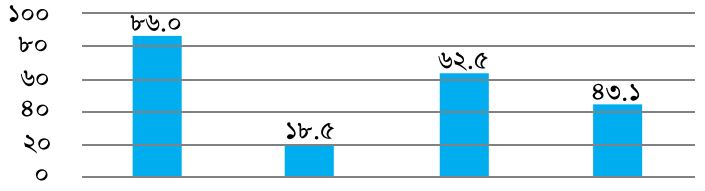

- দুই-পঞ্চমাংশ শিক্ষক দাবি করেছেন যে, তাঁরা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ সম্পর্কে শুনেছেন, তবে কার নেতৃত্বে এটি প্রণীত হয়েছে তা কেবল ৫.৫ শতাংশ শিক্ষক জানতেন। খুব কমসংখ্যক শিক্ষকই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৩.১ শতাংশ শিক্ষক এর শুরুর বছর ও ৩.৬ শতাংশ শেষ বছর সম্পর্কে অবগত আছেন। কেবল ১.৪ শতাংশ শিক্ষক এতে কতটি অভীষ্ট আছে তা বলতে পেরেছেন। প্রতি দশ জনে একজন শিক্ষক জানেন যে, এতে শিক্ষাসম্পর্কে একটি অভীষ্ট আছে, তবে মাত্র ১.৫ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অভীষ্টটি সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখেন ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের বিবিধ দিকসম্পর্কে জানেন এমন শিক্ষকদের শতকরা হার

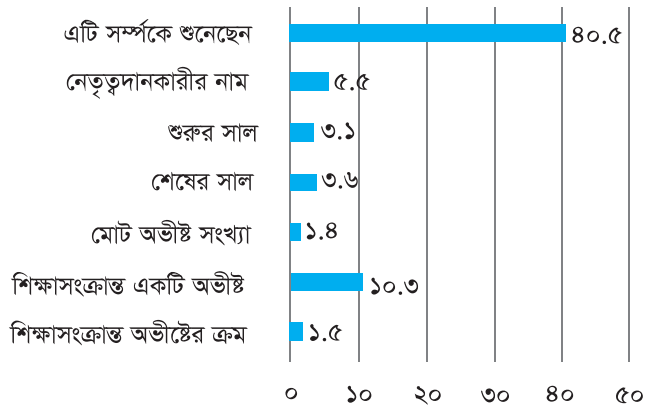

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অন্য শিক্ষকদের তুলনায় বেশি অবহিত, তবে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ শিক্ষকরা নারী শিক্ষকদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন এবং অন্য শিক্ষকদের তুলনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা ভালো ধারণা রাখেন। জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ সম্পর্কিত ধারণার সাথে শিক্ষকদের তিন ধরনের প্রশিক্ষণেরই (পেশাদার, বিষয়ভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত কোর্স) একটি ইতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া গেছে। উপরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যদের তুলনায় তরুণ শিক্ষকদের অধিকতর ভালো ধারণা রয়েছে।

- এ গবেষণায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ছয়টি ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য দুটি শিক্ষক সমিতি শনাক্ত করা গেছে। সমিতির নেতাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংগঠনগুলো নানাভাবে বিভাজিত। এর ফলে সমিতির কার্যক্রমে নানা ধরনের অসঙ্গতি যেমন দেখা দেয়, তেমনি সাধারণ শিক্ষকগণ ও অনেকভাবে বঞ্চিত হন। শিক্ষকদের উন্নয়নকল্পে গৃহীত সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো সাধারণভাবে শিক্ষক সমিতিগুলোর সরাসরি কোনো সহায়তা ছাড়াই বাস্তবায়িত হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে- শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা বাড়াতে শিক্ষক সমিতি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো- সমিতিগুলো কেবল আর্থিক সুবিধা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই কাজ করে।

- প্রতি দশ জন শিক্ষকের মধ্যে তিন জন কোনো না কোনো শিক্ষক সমিতির সদস্য। তাঁদের অধিকাংশ (৬০.৪ শতাংশ) শিক্ষক সমিতির সদস্য হয়েছেন জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বাকি ৩৪.৫ শতাংশ সদস্য হয়েছেন স্বেচ্ছায়। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সদস্য গত এক বছরে সমিতির কোনো না কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। সদস্যদের প্রধানতম কাজটি হলো সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করা; যেখানে ৫৯.৪ শতাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিত সভা ছাড়াও সমিতির অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষকদের অধিকার আদায় সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- চাকরির মেয়াদের নিরিখে চতুর্থ চতুর্থকে আছেন, পুরুষ, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং পেশা ও সম্মানী নিয়ে সন্তুষ্ট- এধরনের শিক্ষকরাই

সাধারণত অন্য শিক্ষকদের তুলনায় অধিক হারে সমিতির সদস্য হন এবং সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ১৩ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন যে, সমিতির বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে তাঁদের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এটা পরিষ্কারভাবেই দেখা গেছে যে সরকার শিক্ষক সমিতির প্রয়োজনীয়তার কথা বরাবর স্বীকার করেছেন, কিন্তু কোনো নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাঁদের মতামত শুনতে চেয়েছেন।

ণ. সুপারিশমালা

এ গবেষণার ফলাফল, ফলাফলের বিশ্লেষণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যেন বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ অভীষ্ট অর্জনের গতি ত্বরান্বিত হয়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে- এ গবেষণার সুপারিশমালার অনেকগুলোই ইতোমধ্যে নীতিতে রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন যথাযথ গতি পাচ্ছে না। এ গবেষণাটি তাই সেগুলোর ওপর পুনরায় গুরুত্বারোপ করছে।

- *প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতের একটি উপযোগী মাত্রা নিশ্চিত করতে হবে*। বর্তমান শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, গত পাঁচ বছরে শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং শিক্ষকদের জন্য অনুমোদিত পদ সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদাভাবে তথ্যবিশ্লেষণ করে এই কাজটি করতে হবে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বেশি (যেমন ৪০:১ এর বেশি) এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এবং যেখানে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষক আছেন সেখান থেকে তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। তবে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কঠিন ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যেসব চাহিদার উদ্ভব হয় সেগুলোকে যত্নসহকারে বিবেচনা করতে হবে। অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের চর্চা এড়িয়ে চলতে হবে।

- *কেবল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বাড়াতে হবে*। জীবনভর শিখনের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রেখে বিষয়ভিত্তিক ও বিবিধ ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যাপ্তি ও সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর সামর্থ্য বিবেচনা করে এটা বলা যায় যে- এগুলো বড়জোর এখনো যারা প্রশিক্ষণবিহীন রয়েছেন তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম, কিন্তু যারা নতুন

করে নিয়োগলাভ করবেন তাঁদেরকে নয়। সক্রিয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং একই সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্র্যাকের যে কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে এ সমস্যার একটা অংশ হয়তো পূরণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যে শিক্ষক যে বিষয়গুলো পড়ান সবগুলোর ওপরই তাঁকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তা হতে হবে একাধিকবার। কিছু সাধারণ প্রশিক্ষণ সকল শিক্ষককে প্রদান করতে হবে; যেমন- শিক্ষাক্রম, শিক্ষানীতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সরকারের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যেসব বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এনজিও) শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনার সামর্থ্য রাখে তাদেরও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্বল্প খরচে শিক্ষকদের কাছে প্রশিক্ষণ পৌঁছানোর নিমিত্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট সুবিধা কাজে লাগানো যেতে পারে।

- *শ্রেণি শিক্ষণের মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার নিমিত্তে শ্রেণিকক্ষে তাঁদের পাঠদান দক্ষতার ওপর ভিত্তিকরে বাৎসরিক শিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে*। শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত শিক্ষণই মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পন্থা। শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিক্ষণ ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ শিক্ষকদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, কিন্তু শিক্ষকদের দায়িত্ববোধের অভাবও একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করে। শ্রেণি কার্যক্রমের নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও এর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের লিখিত মতামত দেওয়া গেলে তা শ্রেণি শিক্ষণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া উচিত কিছু নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন করা। শ্রেণিতে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতি, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে শিক্ষকদের ভূমিকা ও পরামর্শ প্রদান- এ মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ওপরও জোর দেওয়া উচিত।

- *শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে হবে*। এর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সুদক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণাগার,

- মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার প্রতি নজর দিতে হবে। এসব সরঞ্জামাদির মান যেমন ভাল হওয়া জরুরি, তেমনি সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকাটাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা যেন প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ও উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষণ-শিখন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে যদি বিষয়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক থাকে, তবে তা-ও মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

- *মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি ধরন এবং ধরনসমূহের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাসংক্রান্ত যেসব পার্থক্য রয়েছে সেগুলো দূর করার জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে*। এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত- প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে শিক্ষকদের একই পদ্ধতিতে নিয়োগ দান এবং চাকরি ও অবসরকালীন আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা। প্রচলিত শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি সময়ের সাথে যেহেতু শুধু অসমতাই বাড়িয়ে চলেছে, সরকারের পক্ষ থেকে এর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা এখন সময়ের দাবি। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও দাখিল মাদ্রাসার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

- *শিক্ষকতা পেশার প্রতি শিক্ষকদের সন্তুষ্টি এবং কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে 'গ্রেড পরিবর্তনের সাথে পদবির পরিবর্তন' এই নীতি বিবেচনায় রেখে পদোন্নতির নীতিমালা গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা দরকার*। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক দশম গ্রেডে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। যদি বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ওই শিক্ষকের অগ্রগতি সন্তোষজনক দেখা যায় তাহলে পাঁচ বছর পর তাঁকে নবম গ্রেডে উন্নীত করা যেতে পারে, এর ধারাবাহিকতায় দশ বছর পর অষ্টম গ্রেডে এবং ১৫ বছর পর সপ্তম গ্রেডে উন্নীত করা যেতে পারে। এই গ্রেড অনুসারে তাঁদের নতুন পদবি হতে পারে যথাক্রমে সহযোগী শিক্ষক, শিক্ষক ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধান পদগুলোকে প্রশাসনিক পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, এবং এগুলোর জন্য শুধু জ্যেষ্ঠ শিক্ষকগণই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। যদি একটি আলাদা পে-স্কেল বিবেচনায় আনা যায় তাহলে আরও দুটি পদবি যেমন জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক ও জ্যেষ্ঠ সহযোগী শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো, মাধ্যমিকস্তরের যোগ্য শিক্ষকদেরও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে আসীন করা যেতে পারে।

- *একুশ শতকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতির ভূমিকা পর্যালোচনা করার বিষয়টি মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজের গুরুত্বসহকারে ভাবা উচিত*। একই স্তরের শিক্ষকদের নিয়ে অনেকগুলো শিক্ষক সমিতি থাকাটা কোনো সমস্যা নয়। চ্যালেঞ্জ হলো- রাজনৈতিক মাতৃসংগঠনের অনুসারি হয়ে 'ট্রেড ইউনিয়নের' মতো সনাতন ধারার ভূমিকা থেকে বের করে, নতুন প্রজন্মের শিক্ষক তৈরি ও মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে সমিতিগুলোকে আরও দায়িত্বশীল ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কর্মদ্যোগী করে গড়ে তোলা। সরকারের উচিত শিক্ষক সমিতিগুলোকে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা।

- পরিশেষে, এ গবেষণার অনুরূপ একটি গবেষণা প্রাথমিকস্তরের শিক্ষকদের ওপরও করা যেতে পারে। উভয় গবেষণা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র পেতে সহায়তা করবে। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর নিরীখে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ[১]
ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ[১]
ড. মনজুর আহমদ[১]
ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ[১]
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ[২,৪]
রমিজ আহমেদ[২]
অধ্যাপক শফি আহমেদ[১]
তাহ্সিনা আহমেদ[২]
জসিমউদ্দিন আহমেদ[২]
অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ[২]
ড. জাহেদা আহমেদ[১]
চৌধুরী মুফাদ আহমেদ[২]
মোঃ মুরশীদ আক্তার[২]
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার[২]
মাহমুদা আক্তার[২]
শিরীন আকতার[২]
অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম[২]
ড. মাহ্মুদুল আলম[২]
অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম[১]
কাজী রফিকুল আলম[১]
খন্দকার সাখাওয়াত আলী[২]
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী[২]
রুহুল আমিন[২]
ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব[১]
মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ[১]
কাজী রায়হান জামিল[২]
ড. মোঃ আসাদুজ্জামান[১]
ড. আনোয়ারা বেগম[২]
ফাহমিদা বেগম[২]
রাশেদা কে. চৌধূরী[১]
জীবন কে. চৌধুরী[২]
ড. মাহবুব এলাহী চৌধুরী[১]
ড. মোঃ ফজলুল করিম চৌধুরী[১]
ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী[১]
হরিপদ দাশ[২]
সুব্রত এস ধর[১]
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন[১]
এস এ হাসান আল- ফারুক[২]
মোঃ ফসিউল্লাহ[২]
জ্যোতি এফ. গমেজ[১]
শ্যামল কান্তি ঘোষ[১,৪]
মোঃ আহসান হাবিব[২]
জাকি হাসান[১]
সামসে আরা হাসান[১]
কে. এম. এনামুল হক[২]
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক[২,৩]
মেঃ আমির হোসেন[১]
মোঃ আলমগীর হোসেন[২]
মোঃ আলতাফ হোসেন[২]
ইকবাল হোসেন[২]
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন[২]
অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদাত হোসেন[১,৪]
ড. এম. আনোয়ারুল হক[১]
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম[১]
অধ্যাপক মোঃ রিয়াজুল ইসলাম[২]
ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম[২]
ড. শফিকুল ইসলাম[২]
রওশন জাহান[১]
জসীম উদ্দীন কবির[২]
ড. আহমেদ–আল–কবির[১]
মোঃ হুমায়ূন কবির[১]
হুমায়ূন কবির[২]
নুরুল ইসলাম খান[২]

অধ্যাপক ড. বরকত-ই-খুদা[১]
অধ্যাপক মাহ্‌ফুজা খানম[১]
ড. ফাহমিদা খাতুন[১]
পাওয়ান কুচিতা[১]
ড. আবু হামিদ লতিফ[১]
তালাত মাহমুদ[২]
ইরাম মরিয়ম[২]
ইমরান মতিন[২]
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া[২]
মোহাম্মদ মহসিন[২]
ড. মোস্তফা কে. মুজেরী[১]
অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ[১]
ড. গোলাম মোস্তফা[২]
ড. কে এ এস মুরশীদ[১]
সমীর রঞ্জন নাথ[২,৩]
অধ্যাপক ড. একেএম নুরুন নবী[১]
ব্রাদার লিও জেমস্ পেরেইরা[২]
মার্ক টেইলর পিয়ারেস[২]
মোঃ কামরুজ্জামান[২]
মোঃ আবদুর রফিক[২]
কাজী ফজলুর রহমান[১]
জওশন আরা রহমান[১]
ড. এম. এহছানুর রহমান[২]
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান[১]
ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
গৌতম রায়[২]
ড. জিয়া-উস-সবুর[২,৪]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর[১]
জনি এম. সরকার[১]
মোশাররফ হোসেন তানসেন[২]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. প্রতিবেদন প্রণয়নকারী
৪. রিভিউ টিম সদস্য